ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

২. ৪. ‘‘জামাআতুল মুসলিমীন’’ বা তাকফীর ওয়াল হিজরা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দেশ মিসরে এ জাতীয় দাবি উত্থিত হতে থাকে। সাধারণ মুসলিম যুবক ও শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এ চেতনা ক্রমান্বয়ে স্থান লাভ করতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকে মিসরের শাসকগোষ্ঠী এদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করার পরিবর্তে এদেরকে দমন করার পথ বেছে নেন। তাঁদের দাবি পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয় নির্বিচারে অগণিত আলিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সাধারণ নাগরিককে কারাগারে আটক করা হয়। এরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ভদ্র, শালীন ও সৎ যুবক। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অপরাধ বা আইন অমান্যের অভিযোগ পাওয়া যায় নি। একটি মাত্র অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়, তা হলো তারা ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীন’ সংগঠনের সদস্য। আর ‘ইখওয়ানের সদস্য’ বলে কাউকে আটক করার পর উক্ত সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করার কোনো দায় দায়িত্ব মিসরের পুলিশ বাহিনীকে বহন করতে হতো না।

১৯৬৮ সালের দিকে আলী মাহমূদ নামে একজন সাংবাদিক ‘ইসলাম-পন্থী’ হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তিনি ‘ইসলামপন্থী’ হওয়া তো দূরের কথা ধর্মকর্ম যথারীতি পালনের অভ্যাসও তার ছিল না। সর্বাবস্থায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি কারাগারের রোজনামচা প্রকাশ করেন। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন: মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল হাসান তাল‘আত গ্রেফতারকৃত ‘ইসলামপন্থীদের’ সাথে সরাসরি আলাপের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনের দায়িত্ব নেন। তিনি কারাগারে আসলে ১৮/১৯ বৎসরের এক যুবক প্রশ্ন করেন, তাকে কেন বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে, সে তো কোনো দলমতের সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়? তখন লেফটেন্যান্ট সালূমা জেনারেলের কানে কিছু বলেন। তখন জেনারেল গর্জে উঠে বলেন, কেন তোমাকে মসজিদ থেকে গ্রেফতার করা হয় নি? তুমি মসজিদে ছিলে না? তাহলে কিভাবে দাবি করছ যে, তুমি কোনো দলের সদস্য নও? তখন সেখানে উপস্থিত একজন ইমাম শেখ আরিফ বলেন, বাবা, তোমাকে যদি বেশ্যালয় বা মদের আড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হতো, তবে তোমার বাঁচার পথ থাকত। কিন্তু তোমাকে যেহেতু মসজিদে পাওয়া গিয়েছে, কাজেই তোমার দুর্ভ্যাগ্যের শেষ নেই![1]

এভাবে নির্বিচারে নিরীহ, ধার্মিক যুবকদেরকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তারা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচার ও বিচারবহির্ভুত হত্যার সম্মুখীন হন। এ অত্যাচার কতিপয় যুবকের মধ্যে উগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরা খারিজীদের অনুরূপ সন্ত্রাসী চিন্তাচেতনাকে ইসলামী আদর্শ বলে প্রচার করতে থাকে।

এদের অন্যতম ছিল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’।
শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীনের’ সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক ‘বৈপবিক’ চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকান্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এ বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ নামে একটি দল গঠন করেন। সাধারণ মানুষ এ দলকে ‘‘জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ’’ নামে চিনতেন। তাকফীর অর্থ কাফির বলা এবং ‘‘হিজরাহ’’ অর্থ হিজরত বা পরিত্যাগ করা। এ দলের মূলনীতি ছিল তারা ছাড়া সমাজের সকল মানুষই কাফির এবং কাফিরদের সমাজ থেকে হিজরত করে তাদের সমাজে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না।

শুকরী ও তাঁর অনুসারীরা খারিজী মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং খারিজী মতবাদই কুরআন-হাদীস সমর্থিত একমাত্র সঠিক মতবাদ বলে দাবি করেন। খারিজীদের মতই তাদের মধ্যে ইলমের চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। এদের নেতৃবৃন্দের কেউই আলিম ছিলেন না; সকলেই ছিলেন সাধারণ শিক্ষিত যুবক। কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। এছাড়া সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করতেন; কারণ, -তাদের দাবি অনুসারে- তাঁরা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতী রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করেছেন।

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপর, আপসকামী, ‘তাগুত’-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।[2] সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করতেন না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি মানুষ ও মানুষের বুদ্ধি-বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।[3]
এরা খারিজীদের মতই বিভিন্ন যুক্তি ও অযুহাতে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তিকারী সকল মুসলিমকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের মতবাদের ভুলগুলি প্রকাশ করতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তারা মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও গবেষক পন্ডিত ড. মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবীকে অপহরণ করে এবং পরে তাকে হত্যা করে।[4] এ হত্যাকান্ডের পরে সরকার এদেরকে গ্রেফতার করে এবং ৩০/৩/১৯৭৮ তারিখে শুকরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। বাকিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি কারাদন্ড দেওয়া হয়।
দেখা যায় যে, ড. যাহাবীর হত্যাকান্ডের মাধ্যমে একমাত্র মিসর সরকারই লাভবান হন। তাঁরা এ অভিযোগে শুকরী ও তার সহকর্মীদেরকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে সরকার এবং প্রচার মাধ্যম ঢালাওভাবে

ইসলামপন্থী ও ধার্মিক মানুষদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে এবং সরকার নতুন করে ‘ইসলামপন্থীদের’ গ্রেফতার ও অত্যাচারের সুযোগ পান।
সর্বোপরি ড. যাহাবীর মত একজন দলনিরপেক্ষ অথচ স্পষ্টভাষী আলিমের সমালোচনা থেকে সরকার রক্ষা পান।

এ অপহরণ, হত্যাকান্ড, বিচার ও শাস্তিপ্রদানের ‘‘টাইমিংটাও’’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. যাহাবীর অপহরণের পরে মিসরের সাথে ইস্রায়েলের শান্তি আলোচনা শুরু হয় ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মিসরবাসীগণ এবং বিশেষত ‘‘ইসলামপন্থীরা’’ ইস্রায়েলের সাথে চুক্তির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ড. যাহাবীর অপহরণের পর ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার, ধরপাকড় ও নির্যাতনের মধ্যেই এ চুক্তির আলোচনা শুরু ও শেষ হয়। এদের মৃত্যুদন্ড ‘‘ইসলামপন্থী’’-দেরকে ‘‘মেসেজ’’ প্রদান করে যে, কেউ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে তারও এরূপ অবস্থা হবে। যদিও শুকরী ও তার সহচরগণ তাদের মতবাদের ভিত্তিতে ‘কাফির-মুরতাদ’ ড. যাহাবীকে হত্যা করার কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে, তবুও অনেক গবেষক মনে করেন যে, সরকারের অনুচরগণই তাদের গোপনীয়তা, ব্যগ্রতা ও উগ্রতার কারণে তাদেরকে সুকৌশলে এ কর্মে প্ররোচিত করে। বিশেষত, ড. যাহাবীকে অপহরণের মূল দায়িত্ব পালন করেন আহমদ তারিক নামে একজন পুলিশ অফিসার, যিনি অপহরণ ঘটনার কিছু আগে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠার’ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জামা‘আতুল মুসলিমীনে যোগদান করেন।[5]

১৯৭৮ সালের পরে এদের জোরালো উপস্থিতি না থাকলেও এদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদগুলি পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। উগ্রতায় লিপ্ত সমকালীন বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে তাদের এ সকল মতবাদ একইভাবে বিদ্যমান বলে দেখা যায়। এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রাচীন খারিজীগণের ন্যায় শুকরী মুস্তফা ও তাঁর ‘‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’’ বা ‘‘জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরা’’-র মূল বিভ্রান্তি ছিল অতি আবেগ, দীনের বিষয়ে অতি-বাড়াবাড়ি, ধর্ম পালন ও বুঝার অহঙ্কার ও কুরআনহাদীসের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত বা কর্মরীতির গুরুত্ব না দেওয়া। এ থেকে তারা বহুমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১) পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা। ব্যাহিক পাপ না থাকলেও তাদের মতের বিরোধী সকলকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে কাফির বলা।
(২) কুরআন বিরোধী আইনের বিদ্যমানতার কারণে উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসকদেরকে কাফির বলা। এ সকল রাষ্ট্রকে কাফির ও তাগুতী রাষ্ট্র বলে গণ্য করা। এ সকল রাষ্টের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগতের কারণে কাফির বলা। যারা এদের কাফির না বলে তাদেরকেও কাফির বলা। একজন মুসলিমকে প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে মুসলিম বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে স্বীকার না করা।
(৩) এ সকল রাষ্ট্র ও সমাজকে জাহিলী ও কাফির সমাজ মনে করে এগুলি থেকে ‘‘হিজরত’’ করা, বা অন্তত ‘‘মানসিক হিজরত’ করা, অর্থাৎ, মানসিকভাবে নিজেকে এদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা, সমাজের মসজিদগুলিতে জুমআ ও জামাআত আদায় না করা।
(৪) নিজেদের দলকে ‘‘আল-জামাআত’’ বলে দাবি করা এবং তাদের আমিরের হাতে ‘‘বাইয়াত’’ করাকে ইসলামে প্রবেশের শর্ত বলে দাবি করা।
(৫) সমাজের সকল আলিমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা ও তাদের ঘৃণা করা। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম

উম্মাহর সকল আলিম, ইমাম, ফকীহ ও নেককারগণকে ঘৃণা করা ও তারা কেউই ইসলাম সঠিকভাবে বুঝেন নি বা পালন করেননি বলে দাবি করা। আলিম, ইমাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ বা তাকলীদকে শিরক বলে দাবি করা। সকলের জন্য ইজতিহাদ জরুরী বলে দাবি করা।

(৬) ইসলামের ফরয ইবাদগুলির মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা। "দীন প্রতিষ্ঠা" অর্থ "রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা" বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করা এবং বড় ফরযের জন্য ছোট ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করাকে জায়েয বলে দাবি করা। যেমন দীনের প্রয়োজনে (!) ফরয সালাত ত্যাগ, সিয়াম ত্যাগ, দাড়ি মুন্ডন, মদপান, কাফির নারী বিবাহ করা ইত্যাদি।

(৭) ইসলামের বিধিবিধানকে পর্যায়ক্রমিক পালনীয় বলে দাবি করা। তারা দাবি করতেন যে, মিসরের তৎকালীন সময়ে তারা "মক্কী" যুগে অবস্থান করছেন। কাজেই ইসলামের অনেক বিধানই তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৮) শিক্ষাগ্রহণের বিরোধিতা করা, বিশেষত 'তাগূতী' সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ বা সনদগ্রহণকে পাপ বা কুফরী বলে গণ্য করা এবং নিরক্ষর থাকাকে ইসলাম নির্দেশিত বলে দাবি করা।

(৯) "কাফিরদের" বা তাদের মতের বিরোধীদের হত্যা করা বৈধ, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্ম বলে দাবি করা।[6]

ফুটনোট

[1] মুহাম্মাদ সুরুর বিন নাইফ, আল-হুকুম বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ ওয়া আহলুল গুলূ, পৃ. ৩০২।

[2] মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকুম, পৃ. ৫৬।

[3] মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকুম, পৃ. ১২৩।

[4] মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকুম, পৃ. ৯-১১; ২৮৭-৩৫০।

[5] মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকুম, পৃ. ৩২০-৩৪৩।

[6] বিস্তারিত জানতে নিম্নের পুস্তকগুলি পাঠ করুন, ড. হাসান হুদাইবী, দুআতুন লা কুদাত; সালিম বাহনসাবী, আল-হুকুম ওয়া কাদিয়্যাতু তাকফীরিল মুসলিম ও মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে নাইফ, আল-হুকুম বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ ওয়া আহলুল গুলূ। আরো দেখুন: ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওারিজ, পৃ: ১৩২-১৪১, ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ১০৮-১৪৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6898

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন